১৯৭১ ভেতরে বাইরে

অধ্যায়ঃ ১৯৭১ জানুয়ারী থেকে ২৬ র্মাচ

একটি নিরপেক্ষ এবং র্নিমোহ বিশ্লেষন

এই অধ্যায়ে জনাব এ, কে খন্দকার ১৯৭১ জানুয়ারী থেকে ২৬ র্মাচ' পর্যন্ত ঘটনাবলির উপর নিম্মোক্ত কয়েকটি বিষয়ে/ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন্, যা অনেক বির্তকের সৃষ্টি করেছে এবং অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন এই সব মন্তব্য বিশ্লেষন করতে।

"৭ই মার্চের ভাষনে তিনি কি ভাবে স্বাধীনতা র্অজন করেতে হবে তা বঙ্গবন্ধু পরিস্কার করেন নি! একই সঙ্গে বলেছে, "আওয়ামী লিগের পূর্ব্ব প্রস্তুতি না থাকায় যুদ্ধ শুরু করার কথা বলাও একেবারে বোকামি হতো"। "তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়ে বললেন জয় পাকিস্তান" (পৃঃ ২৯ - ৩২)!

তিনি আবার একটু পরেই লিখেছেন "যদি আওয়ামী লিগ নেতাদের কোন পরিকল্পনা থাকত তবে হয়তোবা যুদ্ধটি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যেত (পৃঃ ৩২)। "সত্যি কথা বলতে কি, আমরা রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কোন র্নিদেশ পাই নি (পৃঃ ২৯)"। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে বড় ভূল (পৃঃ ৪৪) হচ্ছে তিনি যদি র্নিদেশ দিতেন তা হলে অনেক অল্প রক্তক্ষয়েই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত! ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নেতৃত্বে বাংগালী সামরিক র্কমর্কতারা পরিকল্পনা করেছিল (পৃঃ ৪৫)। বঙ্গবন্ধুর ২৫ শে র্মাচ রাত্রে চলে যাওয়ার সুযোগ ছিল!

পটভূমিঃ '১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হলো। ফলে আওয়ামী লীগ মেজরিটি পেলো। যার ফলশ্রুতিতে সাংবিধানিকভাবে বঙ্গবন্ধুই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও জানুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধু'কে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত করেন' (মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ)। সেই সময় ঢাকা রেডিও এবং টি ভি'তেও বঙ্গবন্ধুর নামের আগে 'দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী' বিশেষন ব্যাবহার করা হতো। যদিও ভিতরে ভিতরে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ছুতো খুজতে থাকেন এই নির্ব্বাচনের রায় বানচাল করার জন্য। ১লা র্মাচ পাকিস্তানী শাসকরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষনা করলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানী শাসকরা আশা করছিল বঙ্গবন্ধু তাদের এই উস্কানী'তে ফাদে পা দিবেন এবং হঠকারী কিছু করবেন ফলে বিশ্বে বঙ্গবন্ধু'কে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রমান করা খুবই সহজ হবে এবং সংসদ বাতিল করে সামরিক শাসন অব্যাহত রাখা যাবে।

বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লিগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি'তে বিশ্বাস করতেন। তিনি রাজনৈতিক ভাবে ৬ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঙ্গালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করছিলেন (৬ দফার মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসনের প্রক্রিয়ার সাথে স্কটল্যান্ডের স্বায়ত্বশাসনের অনেক আইনগত মিল দেখা যায়)। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং ৭ই জুনের আত্মত্যাগ, ১৯৬৯ এর গন আন্দোলন এবং গন-অভ্যূত্থান'এর মাধ্যমে যে গনজাগরন হয়, তাকে বঙ্গবন্ধু আহরন করেন ১৯৭০ সালের নির্ব্বাচনে ব্যালট বক্সের মধ্যে এবং এরই মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালীর স্বাধিকারের দাবী সাংবিধানিক বৈধতা লাভ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে (আওয়ামী লীগের মত) সাংবিধানিক রাজনীতি'তে বিশ্বাসী এবং একই সাথে নির্ব্বাচনে জয়ী কোন রাজনৈতিক দলের সামরিক শাখা (military wing) থাকার ইতিহাস নাই।

কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক শাখা (military wing) থাকতে পারে কারন কমিউনিস্টদের মন্ত্রই হচ্ছে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উতস" (মাও সে তুং) । প্রক্ষান্তরে অনেক সশস্ত্র আন্দোলন্-রত দলের রাজনৈতিক শাখা (পলিটিকাল উইং) থাকতে পারে। যেমন আইরিস রিপাব্লিকান আর্মী'র রাজনৈতিক শাখা (পলিটিকাল উইং) হচ্ছে Sinn Fein. লেবাননের হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক শাখা (পলিটিকাল উইং) আছে এবং লেবাননের সংসদে তাদের উপস্থিতী এই রাজনৈতিক শাখা (পলিটিকাল উইং) এর মাধ্যমেই। তাই আওয়ামী লীগের মত সাংবিধানিক রাজনীতি'তে বিশ্বাসী এবং একই সাথে নির্ব্বাচনে জয়ী কোন রাজনৈতিক দলের যুদ্ধ পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি না থাকাটাই স্বাভাবিক।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ দুপুরে ইয়াহিয়া খানের পার্লামেন্ট'এর অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষনার সাথে সাথে পরিস্থিতী খুবই দ্রুত বদলে গেলে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন (যারা ছাত্রলীগএর অভ্যন্তরে স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত ছিল) ছাত্রলীগের অধিকাংশ নেতার্কমীরা প্রায় সাথে সাথেই স্বাধীনতা ঘোষনা'র জন্য দাবী তুলে এবং বঙ্গবন্ধুর উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাদের চাপের মুখে বংগবন্ধু যদি ৭ই মার্চ হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতেন তা হলে দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল ভেস্তে যেত তা বলাই বাহুল্য কারন পাকিস্তানী শাসকরা এই ধরনের একটি ছুতোর অপেক্ষায়ই ছিল। স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মাথায়ই ১৯৭২ সালে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, এই সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের নেতার্কমীরাই আরেকটি হঠকারী সিদ্বান্ত নিয়ে জাসদ এবং গন বাহিনী তৈরি করে, যার দুখঃজনক এবং র্মমান্তিক পরিনতী আমরা ৭০ এর দশকে দেখতে পায়েছি। সেই হঠকারী নেতৃত্বের উচ্ছিস্টাংস সিরাজুল আলম খান, রব, শাহাজান সিরাজ, হাসানুল হক ইনু'র করুন রাজনৈতিক পরিনতী আজ সবারই জানা।

সম্প্রতি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, "বন্ধুবর বদরুদ্দীন উমর এ কে খন্দকারের বইয়ের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 'তিনি (শেখ মুজিব) যদি জনগণের ওপর নিরভরশীল হতেন এবং সামরিক বাহিনীর বাঙালী সদস্যের সঙ্গে সম্পরক রাখতেন তা হলে ৭ মারচ রেসকোর্সের ময়দানের বক্তৃতার শেষে দেশের লোককে ঘরে ঘরে দুরগ তৈরির আহবান না জানিয়ে এবং বক্তৃতার শেষে "জয় পাকিস্তান' না বলে ওই মহাসমাবেশেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সমবেত লাখ লাখ মানুষকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে পরিচালিত করতেন এবং বাঙালী সামরিক লোকদের ক্যান্টনমেন্টের দখল নেয়ার আহবান জানাতেন। শেখ মুজিব যদি উমরের

কথামতো লাখো জনতা নিয়ে ঢাকা বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট দখল করার চেষ্টা করতেন, তাহলে অবাঙালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা সংখ্যায় যতই কম হোক তাদের হাতে প্রচুর ভারি অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ ছিল, তারা নিরিচারে কামান দেগে শেখ মুজিবসহ লাখো বাঙালীকে হত্যা করত। বাইরের কোন শক্তি আমাদের রক্ষা করতে আসত না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। আমরা চিরদিনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের গোলাম হয়ে থাকতাম"।

বংগবন্ধু সেদিন হঠকারীভাবে স্বাধীনতার ঘোষনা দিলে, যে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে লাখো মানুষ শুধু 'কামানের খোরাক'এ (cannon fodder) পরিনত হতো তা পরর্বতীতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট দখলের হঠকারী প্রচেষ্টা এবং তার র্মমান্তিক পরিনতী এই যুক্তির বাস্তবতা প্রমান করে (যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসিরউদ্দীন)। বঙ্গবন্ধু ৭ ই মার্চের ভাষনে হঠকারীভাবে স্বাধীনতা ঘোষনা না করে, স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের দিক পরিস্কার নির্দেশন দিয়েছিলেন। তিনি তো বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে র্দূগ গড়ে তোল' 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি.....' 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু ৭ ই মার্চের ভাষন অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বিকল্প সরকার গঠন এবং ধাপে ধাপে সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমি প্রস্তুত করেছিলেন।

আমি ৭ ই র্মাচ রেসর্কোস'এ উপস্থিত না থাকলেও পরদিন ৮ ই র্মাচ সকালে যখন প্রথমবারের মত এই ভাষন রেডিও'তে প্রথম বারের মত সম্প্রচার করা হয় তখন শুনেছিলাম। আমার মনে আছে বংগবন্ধু জয় বাংলা বলেই তার ভাষন শেষ করেছিলেন। বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার জনাব শাহাব ফারুক কখনো রাজনীতি করন নাই বা কোন দলের সাথে জড়িত ছিলেন না। ১৯৭১ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ছাত্র জনাব শাহাব ফারুক, ৭ই মার্চে রেসর্কোসি ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। জয় পাকিস্তান সম্পর্কে তার ভাষ্য নীচে উদ্ধৃত করা হলো, "I was present in that famous Race Course meeting sitting very near from the Podium together with my BUET friends, this is just a blatant lie" সম্প্রতি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দীন আহমেদ তার জীবনের শেষ প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমি এবং আমার মতো অগণিত লোক যারা রেসকোর্স ময়দানে সেই জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শেখ সাহেবের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনছিলাম, তাঁরা শুনলাম, বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শেষ করলেন 'জয় বাংলা' বলে"।

"কেউ কেউ বলেন, তিনি বক্তৃতা শেষ করেন 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেন। কিন্তু টেলিভিশন কেন্দ্রে তার বক্তৃতার যে-ভিডিও ছিল তার চুলচেরা বিশ্লেষন করেও এই অপবাদের কোন সর্মথন পাওয়া যায় নি" (মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ, পৃ ৭১-৭২)। আমিও মনে করি, বঙ্গবন্ধু যদি 'জয় পাকিস্তান' বা 'জিয়ে পাকিস্তান' বলে ভাষন শেষ করতেন তা হলে কি পাকিস্তানী কতৃপক্ষ ২৫ শে র্মাচ এর পর বঙ্গবন্ধু যখন আটক, তখন যুদ্ধরত বাঙ্গালী জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য বার বার রেডিও'তে সেই 'জয় পাকিস্তান' বা 'জিয়ে পাকিস্তান' অংশটি প্রচার করতো না?

এখন চলুন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এবং চট্টগ্রামের সামরিক অফিসারদের পরিকল্পনা প্রসংগে। আমি ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা অবস্থানকালে তিন দিন আমিন ভাই (মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী')র সাথে উনার গুলশানস্থ বাসায় এবং 'প্রথম আলো' অফিসে মুক্তিযুদ্ধের চট্টগ্রাম ভিত্তিক ইতিহাস ও মেজর হায়দার বীর উত্তম' এর শেষ দিনগুলি প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করি। আমিন ভাই তখন 'মুক্তিযুদ্ধে চট্রগ্রাম' নামক বই রচনায় ব্যাস্ত ছিলেন। আমিন ভাই আমাকে তার বাসায় ৭৫ এর নভেম্বরে মেজর হায়দারের মোটর সাইকেল রেখে যাওয়া সম্পর্কে অবহিত করেন; এবং মিসেস নীলুফার হুদা'র (৭ ই নভেম্বরে উচ্ছৃংখল সিপাহী'দের হাতে নিহত শহীদ কর্নেল নাজমুল হুদা, বীর উত্তম এর স্ত্রী এবং 'কর্নেল হুদা এবং আমার যুদ্ধ'র লেখিকা) ফোন নম্বর সংগ্রহ করেন এবং আমাকে মিসেস হুদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমিও 'মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার এবং তার বিয়োগান্ত বিদায়' এর লেখক মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলামের সাথে ফোনে আমিন ভাইয়ের আলাপ করিয়ে দেই।

১৯৭১ সালের ২৪শে র্মাচ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার'এর সাথে আমিন ভাই'ও ঢাকায় আসেন। তিনি কখোনই ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নেতৃত্বে বাংগালী সামরিক র্কমর্কতারা পরিকল্পনা করেছিল এই ধরনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন নাই। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে অবস্থিত বাংগালী অফিসারদের (যেমন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার স্বয়ং, র্কনেল অলি আহমদ বীর বিক্রম, শমসের মবিন চৌধুরী বীর উত্তম, মীর শওকত আলী বীর উত্তম, জিয়াউর রহমান বীর উত্তম) কেঊই কখনো এই ধরনের কোন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন নাই। আমি জানিনা, জনাব এ কে খন্দকার কোন সুত্র থেকে এই ধরনের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন!

২৫-২৬শে মার্চের রাতের ঘটনাবলিই প্রমান করে যে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট'এ এই ধরনের কোন পরিকল্পনা ছিল না কারন ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট'এ যদি এই ধরনের পরিকল্পনা করা হতো বা এমনকি পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথমিক আলোচনাও হয়ে থাকতো, তা হলে ২৫শে র্মাচ রাত্রে ৮০০ বেলুচ রেজিমেন্ট'এর সৈন্য সর্ম্পূন অপ্রস্তুত অবস্থায় ই বি আর সি'তে অবস্থানরত ২০০০ বাংগালী সৈন্যকে হত্যা করতে পারতো না (লক্ষ প্রানের বিনিময়ে, মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম)। ইতিহাসই প্রমান করে যে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে অফিসার বা সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহের নুন্যতম প্রস্তুতিও ছিল না । বরং ২৫শে মার্চে চট্টগ্রামে অবস্থিত ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনৈক সিনিয়র বাংগালী অফিসারের বিরূদ্ধে 'অন্তঘাত' এবং প্রতারনার মত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে (অর্ন্তঘাত ১৯৭১, মানিক চৌধুরী)! জেনারেল নিয়াজীর ভাষায় ''চট্টগ্রাম ছিলো প্রতারনামূলক স্থান (নিয়াজীর অত্মসর্মপনের দলিল, সিদ্দিক সালিক)।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং দেশনায়ক, তিনি বাস্তবতা বুঝতেন, তাই বিভিন্ন মহলের শত চাপ, প্রলোভন অথবা উস্কানির মুখে, এবং একই সাথে ফাকা আশ্বাসে আবেগতাড়িত বা অনুমানর্নিভর হয়ে কোন হঠকারী সিদ্বান্ত নেন নাই। পরর্বতী উদাহরনগুলির মাধ্যমে তা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে কয়জন যোগ দিয়ে ছিলেন তা একটু খতিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হবে। জনাব এ, কে খন্দকার বইয়ের ৩৮ পৃষ্টায় তিনি লিখেছেন ২২শে র্মাচ মেজর জেনারেল ইশফাকুল মজিদ (অব প্রাপ্ত) কতৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত্ব আশ্বাসের কথা, ‘হে বঙ্গবন্ধু, বাংলার স্বাধীনতা কি করে আদায় করতে হয় আমরা তা জানি”। বঙ্গবন্ধু যদি এই সকল আশ্বাস এর উপর বিশ্বাস করতেন তা হলে যে কত ভূল করতেন তা সমগ্র মূক্তিযুদ্ধে মেজর জেনারেল ইশফাকুল মজিদ (অব প্রাপ্ত) এর অনুপস্থিতীই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

২৫ শে র্মাচের হত্যাকান্ড নিজের চোখে দেখার পরও ততকালীন পূর্ব্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে ২০% মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন! শান্তিবাগে অবস্থানরত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এক মেজর রাজারবাগ পলিশ লাইনে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং হত্যার প্রতক্ষ্যর্দশী ছিলেন (নক্ষত্রের রাজারবাগ, মোস্তাক আহমেদ)। অত্যন্ত দুক্ষের বিষয় তিনি ও পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান।

বাংলাদেশে অবস্থানরত একমাত্র বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার (সি ও) লেঃ র্কনেল রেজাউল জলিল তার অধীনস্ত ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এরসাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ১ম বেঙ্গল’কে স্লটার করতে পাকিস্তানী বাহিনী’কে সাহায্য করেছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য ২৫-২৬ র্মাচ ১৯৭১ সালে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোহর ক্যান্টনমেন্ট এর বাইরে প্রশিক্ষনের জন্য অবস্থান করছিল; কিন্ত কমান্ডিং অফিসার (সি ও) র্কনেল রেজাউল জলিল’এর র্নিদেশে তারা যশোহর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসেন। সেনানিবাসে আসার পর রেজাউল জলিল তাদের সবাইকে অস্ত্র জমা দিতে বলেন! তার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বীর উত্তম লে আনোয়ার সেই দিন শহীদ হন (একাত্তরের বীরযোদ্ধা, প্রথম খন্ড সম্পাদক মতিউর রহমান)। অন্য বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার (সি ও) ৭ বেঙ্গল এইচ, এম এরশাদ ১৯৭১ সালে দেশে আসলেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন নাই!

কুমিল্লায় অবস্থানরত কমান্ডো মেজর মান্নান (পরর্বতী সময়ে খালেদা জিয়ার সরকারের বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী!) চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহন করেছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন! রংপুর ক্যান্টনমেন্ট’এ বাঙ্গালীরা সরাসরি আক্রমন করতে গিয়েছিল এবং কয়েক হাজার মানুষ শহীদ হয়েছিল, সেই হত্যাজ্ঞগ্যের নেতৃত্বে ছিল আরেক বাঙ্গালী কূলাঙ্গার অফিসার(যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসির)।

লে কর্নেল ফিরোজ সালাহউদ্দীন (স্বাধীনতা উত্তর ব্রিগেডিয়ার) রাজাকার নিয়োগের দ্বায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল)।

জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব না জানলেও বঙ্গবন্ধু'র ভাল করেই ধারনা ছিল নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য কতদিনে প্রশিক্ষন আর কি পরিমান অস্ত্রের প্রয়োজন। আমাদের দেশের সমতল ভূমি'তে ট্যাংক এবং বিমান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন এবং অস্ত্র ছাড়া সম্মুখ যুদ্ধতো দুরের কথা, গেরিলা যুদ্ধেও সাফল্য র্অজন সম্ভব নয়। পশ্চিম বঙ্গে নকশাল'দের ব্যার্থতা এর চাক্ষুষ প্রমান। ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষনার নির্দেশ না দেওয়া ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষনতার সবচেয়ে বড় প্রমান। আমাদের সবারই মনে রাখা উচিত যে, ৭ই র্মাচ ১৯৭১এ বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা এবং ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী; তিনি কোন কলেজ বা র্ভাসিটির পাতি নেতা বা মেজর/কর্নেলের মত জুনিয়র (see warrant of precedence) সামরিক অফিসার ছিলেন না।

১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানী সৈন্য অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও খুউব একটা কম ছিল না। তার চাইতে অনেক গুরুত্বর্পূন বিষয় হলো, সেই সময় সমগ্র কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল, যোগাযোগ, র্আটিলারী, ট্যাংক, নেভী এবং এয়ারর্ফোস এর সর্ম্পূন র্কতৃত্ব ছিল পাকিস্তানীদের হাতে। শুধু মাত্র সংখ্যার আধিক্যই যদি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার একমাত্র কারন হতো, তা হলে ৩ হাজার ইংরেজ, ৩০ কোটি ভারতীয়'কে ১৯০ বছর পরাধীন রাখতে পারতো না। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজরা খুব সহজেই পরাজিত হতো!

বংগবন্ধু বা অন্য কারো পক্ষেই ২৫শে মার্চের ভয়াবহতা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। ২৫শে র্মাচ রাত্রে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে অকল্পনীয় হত্যাকান্ড চালায় তা যে কারও অনুমানের অনেক বাইরে ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল থেকে ২৪শে র্মাচ ১৯৭১ পর্যন্ত' ১৯ বছরে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির হাতে সারা দেশে বিভিন্ন আন্দোলনে নিহতের পরিমান ছিল সর্ব্বোচ্চ ২০০ – ৩০০। ২৫শে র্মাচ রাত্রে শুধু ঢাকা শহরেই নিহতের সংখ্যা ছিল তার চেয়ে শতগুন, কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ হাজার! ২৫শে র্মাচ রাত্রে যদি বঙ্গবন্ধু চলে যেতেন' তা হলে বলা হতো, তিনি নিরস্ত্র মানুষ'কে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে পালিয়ে গেলেন কেন?

তথ্যসূত্রঃ

১। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ
২।একাত্তুরের গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
৩। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম
৪। একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম
৫। জনযুদ্ধের গনযোদ্ধা', মেজর কামরুল ইসলাম ভুইয়া
৬। একাত্তুর স্মরনে, ডা বেলায়েত হুসাইন
৭।একাত্তুরের জীবন যুদ্ধ, শামসুল ইসলাম সাইদ
৮। স্বাধীনতা ৭১, কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম
৯। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, মেজর নাসিরউদ্দীন
১০। একাত্তর আমার; মোহম্মদ নুরুল কাদের
১১। অর্ন্তঘাত ১৯৭১; মানিক চৌধুরী
১২। তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা; শারমিন আহমেদ
১৩। একাত্তুরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম
১৪। একাত্তরের বীরযোদ্ধা, প্রথম খন্ড সম্পাদক মতিউর রহমান
১৫। 'কর্নেল হুদা এবং আমার যুদ্ধ' নীলুফার হুদা
১৬। অর্ন্তঘাত ১৯৭১, মানিক চৌধুরী, উন্মেস প্রকাশনী, সেক্টর ৩ উত্তরা ঢাকা
১৭। নিয়াজীর অত্মসর্মপনের দলিল, সিদ্দিক সালিক/ ভাষান্তর, মাসুদুল হক
১৮। লক্ষ প্রানের বিনিময়ে, মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
১৯। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ২৫ অক্টোবর ২০১৪ victory1971@gmail.com